শঙ্খনীল কারাগার

হুমায়ূন আহমেদ

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। সারা ঘর নরম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হতো। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথাল পাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। একঘেয়ে কান্নার সুরের মতো সে শব্দ।

আমি কান পেতে শুনি। বাতাসে জাম গাছের পাতার সর সর শব্দ হয়। সব মিলিয়ে হৃদয় হা হা করে উঠে। আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় কী বিপুল বিষণ্নতাই না অনুভব করি। জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি।

প্রচ্ছদ :: কাইয়ুম চৌধুরী

শঙ্খনীল কারাগার

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যপ্রকাশ

বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সব। রাস্তায় পানির ধারা-স্রোত। লোকজন চলাচল করছে না, লাইটপোস্টের বাতি নিবে আছে। অথচ দশ মিনিট আগেও যেখানে ছিলাম সেখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। শুকনো খটখট করছে চারদিক। কেমন অবাক লাগে ভাবতে, বৃষ্টি এসেছে, ঝুপ ঝুপ করে একটা ছোট্ট জায়গা ভিজিয়ে চলে গেছে। আর এতেই আশৈশব পরিচিত এ অঞ্চল কেমন ভৌতিক লাগছে। হাঁটতে গা ছমছম করে।

রাত নয়টাও হয় নি, এর মধ্যেই রশীদের চায়ের স্টল বন্ধ হয়ে গেছে। মডার্ন লন্ড্রিও ঝাপ ফেলে দিয়েছে। একবার মনে হলো হয়তো আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে, রাত বাড়ছে ঠিকই টের পাচ্ছি না। কানের কাছে ঘড়ি ধরতেই ঘড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে মন্টুর গলা শোনা গেল।

রাস্তার পাশে নাপিতের যে সমস্ত ছোট ছোট টুল কাঠের বাক্স থাকে, তারই একটায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আলো ছিল না বলেই এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। চমকে বললাম, মন্টু, কী হয়েছেরে ?

কিছু হয় নি।

স্পঞ্জের স্যান্ডেল হাতে নিয়ে মন্টু টুল বাক্স থেকে উঠে এল। কাদায় পানিতে মাখামাখি। ধরা গলায় বলল, পা পিছলে পড়েছিলাম, স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে।

এত রাতে বাইরে কী করছিলি ?

তোমার জন্যে বসেছিলাম, এত দেরি করেছ কেন ?

বাসায় কিছু হয়েছে মন্টু ?

না, কিছু হয় নি। মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, বলেছে ভিক্ষে করে খেতে।

মন্টু সার্টের লম্বা হাতায় চোখ মুছতে লাগল।

টুনুদের বাসায় ছিলাম, টুনুর মাস্টার এসেছে সে জন্যে এখানে বসে আছি।

কেউ নিতে আসে নি ?

রাবেয়া আপা এসে চার আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছে, বলেছে তুমি আসলে তোমাকে নিয়ে বাসায় যেতে।

মন্টু আমার হাত ধরল। দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে বাইরে, এর ভেতর ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, বাতি-টাতি নিবিয়ে লোকজন ঘুমিয়েও পড়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরই বেশ খানিকটা নির্মমতা আছে। অথচ মাকে এ নিয়ে কিছুই বলা যাবে না। বাবা রাত দশটার দিকে ঘরে ফিরে যখন সব শুনবেন তখন তিনি আরও চুপ হয়ে যাবেন। মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াবেন এবং একদিন ক্ষতিপূরণ হিসেবে চুপি চুপি হয়তো একটি সিনেমাও দেখিয়ে আনবেন।

দাদা, রুনুকেও মা তালাবন্ধ করে রেখেছে, ট্রাঙ্ক আছে যে ঘরটায় সেখানে।

রুনু কী করেছে ?

আয়না ভেঙেছে।

আর তুই কী করেছিলি ?

আমি কিছু করি নি।

ঝুনু বারান্দায় মোড়া পেতে চুপচাপ বসেছিল। আমাদের দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

দাদা, এত দেরি করলে কেন ? যা খারাপ লাগছে।

কী হয়েছে ঝুনু ?

কত কী হয়েছে, তুমি রাবেয়া আপাকে জিজ্ঞেস করো।

গলার শব্দ শুনে রাবেয়া বেরিয়ে এল। চোখে ভয়ের ভাবভঙ্গি প্রকট হয়ে উঠেছে। চাপা গলায় বলল, মা'র ব্যাথা শুরু হয়েছেরে খোকা, বাবা তো এখনো আসল না, কী করি বল তো ?

কখন থেকে ?

আধঘণ্টাও হয় নি। মা'র কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দেব রুনুর, সেই জন্যে গিয়েছি, দেখি এই অবস্থা।

ভেতরের ঘরে পা দিতেই রুনু ডাকল, ও দাদা শুনে যাও, মা'র কী হয়েছে দাদা ?

কিছু হয় নি।

কাঁদছে কেন ?

মা'র ছেলে হবে।

অ! দাদা তালাটা খুলে দাও, আমার ভয় লাগছে।

একটু দাঁড়া, রাবেয়া চাবি নিয়ে আসছে।

এখান থেকে মায়ের অস্পষ্ট কান্না শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু কান্না আছে যা শুনলেই কষ্টটা সম্বন্ধে শুধু যে একটা ধারণাই হয় তাই না, ঠিক সেই পরিমাণ কষ্ট নিজেরও হতে থাকে। আমার সেই ধরনের কষ্ট হতে থাকল।

রাবেয়া এসে রুনুর ঘরের তালা খুলে দিল। রাবেয়া বেচারি ভীষণ ভয় পেয়েছে।

তুই এত দেরি করলি খোকা, এখন কী করি বল ? ওভারশীয়ার কাকুর বউকে খবর দিয়েছি, তিনি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আসছেন। তুই সবাইকে নিয়ে খেতে আয়, শুধু ডালভাত। যা কাণ্ড সারাদিন ধরে, রাঁধব কখন ? মা'র মেজাজ এত খারাপ আগে হয় নি।

হড়বড় করে কথা শেষ করেই রাবেয়া রান্নাঘরে চলে গেল। কলঘরে যেতে হয় মা'র ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে। চুপি চুপি পা ফেলে যাচ্ছি, মা তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, খোকা!

কী মা ?

তোর বাবা এসেছে ?

না।

আয় ভেতরে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

ব্যথাটা বোধহয় কমেছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মা'র মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম আর ফ্যাকাশে ঠোঁট ছাড়া অসুস্থতার আর কোনো লক্ষণ নেই।

খোকা, মন্টু এসেছে ?

এসেছে।

আর রুনুর ঘর খুলে দিয়েছে রাবেয়া ?

দিয়েছে।

যা, ওদের নিয়ে আয়।

রুনু, ঝুনু আর মন্টু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ চুপ থেকেই মা বললেন, কাঁদছ কেন রুনু ?

কাঁদছি না তো।

বেশ, চোখ মুছে ফেলো। ভাত খেয়েছ ?

না।

যাও, ভাত খেয়ে ঘুমাও গিয়ে।

মন্টু বলল, মা, আমি বাবার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব ?

না না। ঘুমাও গিয়ে। রুনুমা, কাঁদছ কেন তুমি ?

কাঁদছি না তো।

আমার কিছু হয় নি, সবাই যাও ঘুমিয়ে পড়। যাও, যাও।

ঘর থেকে বেরিয়েই কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল আমার। আমাদের এই গরিব ঘর, বাবার অল্প মাইনের চাকরি, এর ভেতর মা যেন সম্পূর্ণ বেমানান।

বাবার সঙ্গে তার যখন বিয়ে হয়, তিনি তখন ইতিহাসে এমএ পরীক্ষা দেবেন। আর বাবা তাদের বাড়িরই আশ্রিত। গ্রামের কলেজ থেকে বিএ পাশ করে চাকরি খুঁজতে এসেছেন শহরে। তাঁদের কী যেন আত্মীয় হন।

বিয়ের পর এই বাড়িতে এসে ওঠেন দু'জন। মা'র পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। কিছু দিন কোনো এক স্কুলে মাস্টারি করেছেন। সেটি ছেড়ে দিয়ে ব্যাংকে কী একটা চাকরিও নেন। সে চাকরি ছেড়ে দেন আমার জন্মের পর পর। তারপর একে একে রুনু হলো, ঝুনু হলো, মন্টু হলো—মা গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে।

সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মা আমাদের গরিব ঘরে এসেছেন বলেই তাঁর সামান্য রূপের কিছু কিছু আমরা পেয়েছি। তাঁর আশৈশব লালিত রুচির কিছুটা (ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও) সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। শুধু যার জন্যে তৃষিত হয়ে আছি সেই ভালোবাসা পাই নি কেউ। রাবেয়ার প্রতি একটি গাঢ় মমতা ছাড়া আমাদের কারও প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। মা'র অনাদর খুব অল্প বয়সে টের পাওয়া যায়, যেমন আমি পেয়েছিলাম। রুনু-ঝুনুও নিশ্চয়ই পেয়েছে। অথচ আমরা সবাই মিলে মাকে কী ভালোই না বাসি!

উকিল সাহেবের বাসায় টেলিফোন আছে। সেখান থেকে ছোট খালার বাসায় টেলিফোন করলাম। ছোট খালা বাসায় ছিলেন না, ফোন ধরল কিটকি।

কী হয়েছে বললেন খোকা ভাই ?

মা'র শরীর ভালো নেই।

কী হয়েছে খালার ?